ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 262-266
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.031

ভারতবর্ষের নাট্য-ঐতিহ্যে থার্ড থিয়েটার

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী, *প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, উদয়পুর, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 15.11.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The word "theatre" is an imported term, and it is one of the oldest art forms in the world. The ancient Greek drama and our country's Sanskrit theatre have evolved and continued to flow through both ends of the world. To make this important medium of communication more active, experiments are being conducted in countries around the world. Our country is not lagging behind in this new exploration. Along with the first and second theatres, Bengali theatre has also sought the third theatre. Playwright Badal Sarkar is the main leader in this movement. According to Badal Sarkar, to understand the essence of third theatre, we must first understand the concepts of the first and second theatres. The first aspect involves showing the absurdities of history and society through comic plays. The second aspect refers to traditional forms in our rural society, such as Tamasha, Nautanki, Ramleela, and Jatra. 'Third Theatre' is the theatre that exists outside of these two traditions. Those who write plays must consider both the production aspects and the social responsibility of theatre. In three sentences, Badal Sarkar's concept of third theatre can be described: it can be done in various situations, it can be easily transported, and it is not overly dependent on money. The primary goal of third theatre is to transcend the boundaries of the middle and upper classes, and educated people, to become a means of awakening for the uneducated masses. In this form, both the actor and the audience are on the same level.

Keywords: Third Theatre, Playwright, Audience, Renaissance.

নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজক ইউজেনিও বারবা ১৯৭৬ সালেই সর্বপ্রথম 'থার্ড থিয়েটার' কথাটা সচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই নামে তিনি নাট্যদলও গঠন করেছিলেন। এরপর পোল্যান্ডের গ্রোটোস্কি এটিকে বলেছিলেন 'Poor theatre' অর্থাৎ 'গরীবের নাটক'। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন এটি 'Free theatre' অর্থাৎ 'মুক্ত থিয়েটার'। শহরের জনসাধারণ এখন বাংলা থিয়েটার বলতে গ্রুপ থিয়েটারকেই বোঝেন। বর্তমানে শহরের সবটুকুকে ধরে রেখেছে এই গ্রুপ থিয়েটারই। টিকিট বিক্রি থেকে ওঠা টাকায় এই দলগুলি পরিচালিত হয়। এইরকম নাট্যদলের সন্ধান মিলে বাংলার মফস্বলেও। তবে থিয়েটার শব্দটির সাথে ততোটা পরিচিত নন প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষজন। থিয়েটারের বিভিন্ন বিষয়কে আত্মস্থ করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাননি এরা। গ্রামাঞ্চলের এক অন্যতম ও জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম হচ্ছে যাত্রা। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটি অভিনিত হলেও যাত্রা গ্রামাঞ্চলেরই সংস্কৃতি। এটি যারা প্রযোজনা করে তাকে অপেরা বলা হয়ে থাকে। যদিও অপেরা কথাটি এসেছে পাশ্চাত্য গীতিনাট্যর থেকে।

অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে শখের নাটকগুলো অভিনিত হয়, সেগুলো মূলত গ্রামবাংলারই সম্পদ।

থিয়েটারের কিছু সামাজিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। একথা কেউই অস্বীকার করার অবকাশ পাবেন না। কারণ প্রতিটি থিয়েটারের উৎসের সাথেই এর সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয় জড়িত। থিয়েটার এমন একটি বোধগম্য মাধ্যম, যা সবথেকে সহজভাবে, একজন পড়াশোনা না জানা মানুষের মধ্যেও তার ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে। তাইতো বিভিন্ন সময় আমরা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের হস্তক্ষেপের কথা শুনতে পাই। এদিক থেকে এটি গল্প, উপন্যাসের চেয়েও সক্রিয়। গান শোনা বা গল্প-উপন্যাস পড়ার সময় আমরা অন্যমনস্ক হতেই পারি। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় নেই। এ যেনো চুম্বক শক্তির মতো তার দর্শককে ধরে রাখে। সংলাপ, গান, বাজনা, লাইট, সেট, মেক্আপ; এগুলো নিয়েই নাটক। নাটকের সাথে কবিতা মিলিয়ে কাব্যনাট্য, গান মিলিয়ে গীতিনাট্য, নাচ মিলিয়ে নৃত্যনাট্য, বাচিক প্রকরণের সাথে বন্ধুত্ব করে হয় শ্রুতিনাট্য। শিল্পের বিভিন্ন শাখার সাথে নাটকের এই বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবই নাটককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে গেছে। নাটকের এই স্বভাব আকৃষ্ট করেছিলো বাদল সরকারের মতো মানুষকে। তিনি জীবনের অনেকটা সময় ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। শেষে নাটকের নেশায় জড়িয়ে পড়েছেন।

বাদল সরকারের খ্যাতি মূলত ছিলো হাসির নাটকের লেখক হিসেবে। তবুও 'ইন্দ্রজিৎ', 'পাগলা ঘোড়া', 'বাকি ইতিহাস' ইত্যাদি নাটক রচনায় তাঁর খ্যাতি যেনো একেবারেই শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে তাঁকে। যদিও বাদল সরকার হাসির নাটককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান। তিনি একটি আলাপচারিতায় জানিয়েছিলেন প্রকৃত হাসির নাটক লেখার ইচ্ছার কথা।

যদিও বাদল সরকারের নিজস্ব স্বভাব তাঁকে মানুষের প্রশংসাতে বিভোর না করে আরও বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাঁর চিন্তাভাবনা যেনো একেবারে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে গেছে। এ ব্যাপারে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- ''...এই লোকটা প্রসীনিয়াম থিয়েটারে এখনো দাঁড়ালে একটা জায়ান্ট। কিন্তু যেদিন তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে প্রসীনিয়াম থিয়েটারটা আমার থিয়েটার না... তখনই তিনি প্রসীনিয়াম থিয়েটার ছেড়ে চলে এলেন, যেন মড়া পুড়িয়ে কলসী ভেঙ্গে একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে চলে এলেন।''[১]

বাদল সরকার কলকাতার বিদগ্ধ নাট্যজন হয়েও গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের কাছে গেছেন। লোকনাট্য সাধারণ মানুষের নাটকই হয়ে উঠেছে বাদল সরকারের মতে। তারপরও থার্ড থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 'থিয়েটারের ভাষা'-তে তিনি মত প্রকাশ করেন যে- ''গ্রামের লোকনাট্য জনপ্রিয়, শ্রমজীবি জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছায়, কিন্তু একদিকে সে নাট্যে পশ্চাদপদ ভাবধারা ও প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধ প্রচারিত হচ্ছে, অন্যদিকে সে নাট্য ব্যবসায়ীদের বিক্রয় পণ্যে পরিণত হচ্ছে -এইখানে বর্তমান কালীন সীমাবদ্ধতা। অপরপক্ষে শহরের মঞ্চ নাট্যের অন্তত একটা অংশ প্রগতিশীল ভাবধারা ও মূল্যবোধ তুলে ধরতে পারছে। কিন্তু তা শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত দর্শকদের মধ্যে সীমিত রয়ে যাচ্ছে; এবং তার মঞ্চ শৈলী এমন যে তাকে সহজে বা সল্প ব্যয়ে দেশের বৃহত্তম জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না -এ নাট্যের সীমাবদ্ধতা এই ক্ষেত্রে।''[২]

আবার আরেক জায়গায় বাদল সরকার বলেছেন-

> ''A unfortunate dichotomy between urban and rural life. The dichotomy is expressed in disparities in economic standards, services, educational levels and cultural developments..... Theatre is one of the fields where this dichotomy manifest rated most. The city theatre today is not natural development of the traditional or folk theatre in the urban setting as it should have been."[৩]

এই দুই থিয়েটারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে 'থার্ড থিয়েটার'-

"Workshop for a theatre of synthesis as a rural urban link."[৪]

এবারে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের তিনটি দিকের বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে বাদলবাবু বলেছেন যে, নাটক হবে এমন যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় করা যায়। এর মানে নাটককে হতে হবে নমনীয়। তবেই তো বিভিন্ন অবস্থায় এটিকে সহজে অভিনিত করা যাবে। এরপর তিনি বলেছেন, নাটক হবে এমন যা সহজে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। এর মানে নাটক হবে বহনীয়। তবেই তো বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নাটককে অভিনিত করা সহজ হবে। নাটক যদি স্থানান্তরিত না করা যায়, তবে তার মর্মকথা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছাতে পারবে না। তাই নাটককে স্থানান্তরিত করা গেলে বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য তা খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। শেষে বাদল সরকার বলেছেন নাটক হবে এমন যা টাকার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল নয়। এর মানে এটি হবে সুলভ। নাটক যদি খুব কম খরচে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে এ কাজে আমরা আরও অনেককে একত্রিত করতে পারবো। আর যদি নাটক শুধুমাত্র টাকার উপর নির্ভর করে হয়, তবে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক কারণে অনেকেই অংশগ্রহণ করতে চাইবে না। এর পাশাপাশি নাটক রচয়িতারাও এ ধরণের কাজে উৎসাহ খুঁজে পাবেন না। তাই নাটক বিশেষভাবে টাকার উপর নির্ভরশীল হবে না।

'থার্ড থিয়েটার' মনে করে যে, আমাকে বসে থাকলে চলবে না। আমাকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষজনদের কাছে যেতে হবে। 'থার্ড থিয়েটার' আশা করে না যে মানুষ তার কাছে আসবে। তাই 'থার্ড থিয়েটার'-কে হতে হয় নমনীয়। এর পাশাপাশি এর স্বভাব হবে স্থানান্তরিত করা যাবে এমন। এটি শিবলিঙ্গের মতো অনড় হবে না, তবেই এটিকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আর এ কাজে আরও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোতে খরচ না হলে তখন টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করারও কোনও প্রয়োজন হবে না। খুশি মনে নাটক দেখে দর্শকরা যা দিয়ে যাবে, তাতেই থিয়েটার বেঁচে থাকবে। অর্থের ব্যাপার একটা বড় ব্যাপার গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও। তাই কোনও গ্রুপ থিয়েটারই শহরের লাভজনক জায়গা ছেড়ে যাবেন না বাংলার গ্রামে-গঞ্জে। তাইতো থার্ড থিয়েটারের উপর দ্বায়িত্ব বেড়ে গেলো। একমাত্র থার্ড থিয়েটারই পারে তার তৃতীয় ভাবনার সূত্র ধরে সঠিক বার্তা সহজ পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

থার্ড থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১ সালে ১১ই ডিসেম্বর কার্জন পার্কে এক পরীক্ষামূলক অভিনয়ের দ্বারা। তারপর একে একে এগিয়ে এলো অনেক নাট্যদল- বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কস্, ব্রাইট ফিউচার, শিল্পী ফৌজ, স্পতম, শপথ, সিচুয়েট ইত্যাদি।

এবারে থার্ড থিয়েটারে অভিনিত নাটকটিকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলার জন্য অনেক বিষয়েই নজর রাখতে হবে। যেমন- নাটকটি কোথায় অভিনিত হবে, সেটি খেয়াল রাখতে হবে। শহরে অভিনিত হবে নাকি গ্রামে অভিনিত হবে, রাস্তাঘাটে অভিনিত হবে নাকি কোনও বাজারে অভিনিত হবে, সেটি আগে স্থির করে নিতে হবে। কারণ এক এক জায়গায় এক এক পরিবেশ বর্তমান। এরপর খেয়াল রাখতে হবে নাটকটি কোন্ সময় অভিনিত হবে। সকালে অভিনিত হবে নাকি বিকেলে, দুপুরে অভিনিত হবে নাকি সন্ধ্যা-রাতে অভিনিত হবে, সেটিও নাটকের বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

ভাষা হলো ভাব প্রকাশের মাধ্যম। এই ভাষা-মাধ্যমের সাহায্যেই আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নিই। থার্ড থিয়েটারের ক্ষেত্রে ভাষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, যেখানে নাটকটি অভিনিত হবে, সেখানকার মানুষের কাছে এর ভাষা বোধগম্য হবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে ভাষার গঠন কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হবে। নয়তো সকল পরিশ্রমই বৃথা হবে।

থার্ড থিয়েটারের প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এরপর দেখতে হবে যেখানে নাটকটি অভিনিত হবে সেখানকার মানুষের লোকবিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি কেমন। যদি নাটক পরিচালকেরা এগুলো মাথায় রেখে নাটককে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন, তবেই তারা সামগ্রিকভাবে সফল হবেন।

প্রসেনিয়াম থিয়েটারে অভিনেতা ও দর্শক আলাদা আলাদা জায়গাতে অবস্থান করে। ফলত অভিনেতারা দর্শকদের দেখতে পান না। আর থার্ড থিয়েটারে যেহেতু দর্শক ও অভিনেতা একই জায়গাতে অবস্থান করে, সেহেতু সেখানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে মতের আদান প্রদানের অবকাশ রয়েছে। যদিও বাদলবাবু কখনোই তাঁর থিয়েটারকে 'এক্সপেরিমেন্টাল' বলে আখ্যা দেননি। 'কনটেন্ট'-ই মূখ্য ভূমিকা পালন করে তাঁর থিয়েটারে। তিনি বলেছেন-

> ''What আর How, আমাদের ক্ষেত্রে What-টা প্রাথমিক -How-টা সেকেন্ডারী ...আমরা কর্মের এক্সপেরিমেন্ট করিনি, অনুসন্ধান করেছি।''[৫]

-কীভাবে কনটেন্টকে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তারই অনুসন্ধান।

বাদল সরকার ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। তাই তাঁর চিন্তা থেকে বের হওয়া থার্ড থিয়েটারকে তিনি রাজনৈতিক থিয়েটার হিসেবেই দেখতে বেশি পছন্দ করেন। যদিও পরবর্তীতে তিনি রাজনীতি থেকে বেড়িয়ে আসেন। নিজের চিন্তাভাবনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর রাজনীতির আশ্রয় নেননি, বরং বেছে নিয়েছেন থার্ড থিয়েটারকে। এই থিয়েটারের বিষয় কী হবে? সে সম্পর্কে বাদল সরকার বলেন-

> ''খুব সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে, কনটেন্ট হল সমাজ পরিবর্তন।''[৬]

বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রকে শ্রেণীশোষণের যন্ত্র বলেছিলেন, একথা সত্য। কারণ আমরা দেখতে পাই এই রাষ্ট্রনামক যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে। তাদেরকে ভোলানো হচ্ছে প্রতিনিয়তই। দিনের পর দিন রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদেরকে শোষণ করে যাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষ হয়তো অবগত, নয়তো অবগত নয়। তাদের উপর ক্রমশই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানারকমের 'টেক্স' বা 'কর'। ফলত সর্বহারারা তাদের সবকিছু আরও দ্রুত গতিতে হারাচ্ছে। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। দিনের পর দিন তাদেরকে কম মজুরিতে রাত-দিন পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাইতো তারা একটা সময়ের পর বিপ্লবের পথ অবলম্বন করে। বিপ্লবের মাধ্যমেই তারা রাষ্ট্রকে জানান দিতে চায় যে, আর নয়, অনেক হয়েছে। এবার সকলকে সচেতন হতে হবে। নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য একত্রে লড়াই করতে হবে। রাষ্ট্র-রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে চায় এই 'থার্ড থিয়েটার'। এটিই ডাক দেয় দিন বদলের। মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়, নতুনভাবে বাঁচতে শেখায়, নতুন করে পথ চলতে শেখায়। যদিও রাষ্ট্র নামক শ্রেণীশোষণের যন্ত্রের ডাকে আমরা বিভ্রান্ত হই। রাষ্ট্র যখন বোঝায় যে, কৃষিজ ফসলের মাধ্যমে ডলার কামানো যেতে পারে, তখন আমরা লালায়িত হই। তখন একবারও ভাবি না যে, এই ডলার আমাদের দেশের ক'জন কৃষকের দিনবদল করতে পেরেছে। দেখা যায় যে, দিনের পর পর কঠোর পরিশ্রম করে, বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে যারা ধান উৎপাদন করে, তাদের পেটেই দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে না। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। কারও ঘরের চাল নেই, পরিধান করার মতো ভালো বস্ত্র নেই ইত্যাদি আরও অনেক রকমের বঞ্চনার তারা স্বীকার হন। 'থার্ড থিয়েটার' এসবের হিসেব রাখে। 'থার্ড থিয়েটার' মানুষের অধিকার সম্পর্কে খুব সচেতন। এরা চায় মানুষকে মানুষের যোগ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে, যোগ্য সম্মানটুকু এনে দিতে।

আবারও বাদল সরকার থার্ড থিয়েটারের ভাষা কী হবে, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এ নিয়ে অনেক গবেষণাও করেছেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রলাল স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বলেন-

> ''ভাষা জিনিসটা একটা সঙ্কেত; সঙ্কেতটা একটি সমাজের সব মানুষ আয়ত্ত করেছে ছোটবেলা থেকে; তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সেই সঙ্কেতের মাধ্যমে।''[৭]

বাদল সরকার মূলত ভাষা বলতে যা যা বুঝিয়েছেন, সেগুলি হলো- চোখের ভাষা, মুখভঙ্গির ভাষা, অঙ্গভঙ্গির ভাষা, স্পর্শের ভাষা, সুরের ভাষা, সংলাপের ভাষা, ছবির ভাষা ইত্যাদি। 'থার্ড থিয়েটার' যেহেতু মঞ্চহীন, সরঞ্জামহীন, সেহেতু এখানে ভাষাটাই মূখ্য। অঙ্গভঙ্গি ও অঙ্গসঞ্চালন এখানে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে স্থির দাঁড়ানো মানুষজনও কখনও গাছের ইঙ্গিত দেবে অথবা দেওয়ালের ইঙ্গিত বহন করবে। এছাড়া এ নাটকের সংলাপকে হতে হবে অধিক চিত্তাকর্ষক। কারণ এ থিয়েটারের দর্শক অধিকাংশই কাজের থেকে ঘরে ফেরার পথের মানুষজন। এ নাটকে থাকবে টানটান উত্তেজনা। এই নাটকে- কী জানো? কী জানতে না? কী জেনেছো? কী কথা? কী বলতে চাও? -এগুলোই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার, যা থিয়েটারে দেখানো হয়ে থাকে। এই করে দর্শকদের আগ্রহ আরও জাগিয়ে তোলা হয়।

যদিও থার্ড থিয়েটারের ভবিষ্যত নিয়ে একেবারেই আশাবাদী নন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিরণ মৈত্রের মতো নাট্যব্যক্তিত্বরা। ১৯৮২ সালে ১৭ই জুলাই দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় 'সাম্প্রতিক নাট্যচিন্তা' নামক প্রবন্ধে কিরণ মৈত্র বলেছেন- 'অধুনা আবার থার্ড থিয়েটার নামে কায়দাসর্বস্ব একটা ব্যাপার ঘটছে। ৫০/৬০টা দর্শক বসতে পারে এমন হলে আমরা নাটকের নামে নানারকম জিমন্যাস্টিক, এ্যাক্রোবেটিক কায়দা দেখাচ্ছি। দেখতে মজা লাগে। যদিও শিল্পীরা গলদঘর্ম হয়ে দু'ঘন্টা কসরত করে। কিন্তু ফললাভ হয় না।''[৮] যদিও স্পষ্টত এই কথা বলা যাবে না যে ফললাভ হয় না। কারণ ১৯৮২ সালের থার্ড থিয়েটার ২০০৫ সাল পর্যন্ত তার কর্মে অবিচল থেকেছে। আবার এও দেখা গেছে যে, অনেক আগেই পোলান্ডের গ্রোটাস্কি প্রসীনিয়াম মঞ্চকে বাদ দিয়ে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্টেজকে দর্শকদের মধ্যে এগিয়ে দিয়েছিলেন উৎপল দত্তের মতো প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিত্বও। যদিও গণনাট্যের পোস্টার ড্রামা বা পথনাটকের সঙ্গে পার্থক্য আছে থার্ড থিয়েটারের।

তৃতীয় বিকল্পের থিয়েটার 'থার্ড থিয়েটার'। তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্য সাধন নয়, প্রকৃত সত্য উদঘাটনই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। দর্শকদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এপিক থিয়েটারের যোগ্য উত্তরসূরী এই 'থার্ড থিয়েটার'। তবুও 'থার্ড থিয়েটার' কি পারবে সকল স্তরের মানুষকে আপন করে নিতে? এ প্রশ্নের উত্তরই আমাদেরকে নতুন আলো ও নতুন আশার কাছে নিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখপঞ্জি:

১) হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায়- সাহিত্য-প্রবন্ধ : প্রবন্ধ-সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : মহালয়া, ২০১৪, পৃষ্ঠা-৪৫৪
২) তদেব, পৃ-৪৫৪
৩) তদেব, পৃ-৪৫৫
৪) তদেব, পৃ-৪৫৫
৫) তদেব, পৃ-৪৫৬
৬) তদেব, পৃ-৪৫৬
৭) তদেব, পৃ-৪৫৭
৮) তদেব, পৃ-৪৫৮